বাংলা ধ্বনির উচ্চারণ তত্ত্ব

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

স্বরধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু কোনো প্রকার বাধা না পেয়ে এবং অন্য কোন ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই নিজে পূর্ণ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মোট স্বরধ্বনির সংখ্যা হল ১১টি। এর মধ্যে মৌলিক স্বরধ্বনি হল ৭টি।

স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ: বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া ও উচ্চারণের রীতি অনুসারে বাংলা স্বরধনিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা—

১. উচ্চারণ সময়ের কম-বেশি পার্থক্য অনুসারে বাংলা স্বরধনিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. হ্রস্ব স্বরধ্বনি:- যে ধ্বনি উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে তাকে বলে হ্রস্বস্বর। বাংলা হ্রস্ব স্বরধ্বনি চারটি— অ ,আ, ই, ও।

খ. দীর্ঘ স্বরধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে, তাদের বলে দীর্ঘ স্বরধ্বনি। বাংলায় দীর্ঘ স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি।– আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, অ্যা, ঔ।

২. স্বরধ্বনির গুনগত শ্রেণিবিভাগ: স্বরধ্বনির গুনগত শ্রেণিবিভাগের মানদন্ড হল তিনটি- ক. জিহ্বার অবস্থান, খ. মুখবিবরের শূণ্যতার পরিমাপ ও গ. ওষ্ঠের আকৃতি অনুযায়ী।

ক. জিহ্বার অবস্থান অনুসারে স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ:

- **সম্মুখ স্বরধ্বনি:** যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সামনের দিকে এগিয়ে আসে তাকে সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে। যেমন- ই, এ, অ্যা।
- **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি:** যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা পিছন দিকে অর্থাৎ গলার দিকে গুটিয়ে যায়, তাকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে। যেমন- অ, ও, উ।
- **কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি:** সম্মুখ স্বর ও পশ্চাৎ স্বরের মাঝামাঝি অবস্থানে জিভকে রেখে যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি বলে। যেমন- আ।
- **উচ্চ স্বরধ্বনি:** যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা স্বরধ্বনির এলাকার মধ্যেই সর্বোচ্চ অবস্থানে বা তার কাছাকাছি অবস্থানে থাকে, তাকে উচ্চস্বরধ্বনি বলে। যেমন- ই, উ।
- **নিম্ন স্বরধ্বনি:** যে স্বরধ্বনি জিভকে একেবারে নীচে নামিয়ে উচ্চারণ করা হয়, তাকে বলে নিম্ন স্বরধ্বনি। যেমন- 'আ'।
- **উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি:** উচ্চ স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান থেকে নীচে মুখের ভিতরে যে শূন্যস্থান থাকে, তার সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে জিভকে নীচে নামিয়ে এনে যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তাকে উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি বলে। যেমন- এ, ও।

- **নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি:** উচ্চ স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান থেকে নীচে মুখের ভিতরে যে শূন্যস্থান থাকে, তার মধ্যে নীচ থেকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে জিভকে উপরে তুলে ধরে যে স্বরধ্বনির উচ্চারণ করা হয়, তাকে নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি বলে। যেমন- অ্যা, অ।

খ. মুখবিবরের শূণ্যতার পরিমাপ অনুসারে স্বরধ্বনির শ্রেনিবিভাগ

- **সংবৃত স্বরধ্বনি :** 'ই', 'উ' স্বরধ্বনি গুলোকে মুখবিবর সংবৃত (মুখগহ্বরে শূন্যতার পরিমাণ সবচেয়ে কম) হয়ে যায় বলে এদের নাম সংবৃত স্বরধ্বনি।
- **বিবৃত স্বরধ্বনি :** 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবর বিবৃত হয় বলে একে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে।
- **অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি:** 'এ' এবং 'ও' ধ্বনি দুটি উচ্চারণের সময় মুখগহ্বর কিছুটা সংকুচিত হয় বলে এদের বলে অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি ।
- **অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি:** 'অ', অ্যা, -ধ্বনি দুটো উচ্চারণের সময় মুখবিবরের প্রসারণ কিছুটা কমে যায় বা সম্পূর্ণ প্রসারিত হয় না তাই এদের অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি বলে।

গ. ওষ্ঠের আকৃতি অনুসারে স্বরধ্বনির শ্রেনিবিভাগ

- **প্রসারিত স্বরধ্বনি** : ওষ্ঠকে দু'দিকে প্রসারিত করে আমরা যে ধ্বনি উচ্চারণ করি, তাকে প্রসারিত স্বরধ্বনি বলে। যেমন- 'ই', 'এ' 'অ্যা'।
- **কুঞ্চিত বর্তুল স্বরধ্বনি** : ওষ্ঠ দুদিকে প্রসারিত না হয়ে ফুঁ দেওয়ার মত গোল হয়ে কুঞ্চিত আকার ধারণ করে যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে কুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলে। উ, অ, ও।

❖ **মৌলিক স্বরধ্বনি:** যে সব স্বরধ্বনিকে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদের মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি সাতটি- অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

❖ **যৌগিক স্বরধ্বনি:** দুটি স্বরধ্বনি যোগে গঠিত স্বরকে যোগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর বলে। বাংলা বর্ণমালায় যুক্তস্বরবর্ণ দুটি- ঐ-(ও + ই), ঔ- (ও+ উ)। এ ছাড়াও আরো ২৭টি যুক্ত স্বরধ্বনি আছে কিন্তু তাদের কোন বর্ণরূপ নেই।

❖ **প্লুতস্বর:** সংগীতের সময়, বিলাপ বা আহ্বানের সময় কোন স্বরকে অতিরিক্ত বিলম্বিত বা দীর্ঘ করলে তাকে বলে প্লুত স্বর। এমন- বাছারে-----এ---এ------এ----এ।

❖ **অনুনাসিক স্বরধ্বনি:** যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু শ্বাসনালী থেকে বহির্গমনের সময় মুখ ও নাসিকা পথে নির্গত হয়, সেই স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক বা সানুনাসিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যোগে অনুনাসিক স্বরধ্বনি নির্দেশ করা হয়। এমন—আঁ, এঁ, এঁকে ইত্যাদি।

❖ **অর্ধস্বরধ্বনি:** যে স্বরধ্বনি সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না এবং যার দল বা অক্ষর গঠনের ক্ষমতা থাকে না তাকেই বলা হয় অর্ধস্বরধ্বনি। বাংলায় অর্ধস্বর চারটি- ই্, এ্, উ্, ও্। যেমন- দই= ই্ (অর্ধস্বর)।

- নীচের ছবিটিতে মুখের মধ্যে উচ্চারণের দিক থেকে স্বরধ্বনিগুলির অবস্থানের একটি প্রতীক-চিত্র দেওয়া হল। এর বাঁ দিকটা মুখের সম্মুখ দিক, ডানদিকটা পশ্চাৎ। উপরটা ঊর্ধ্ব, নীচের দিকটা নিম্ন।

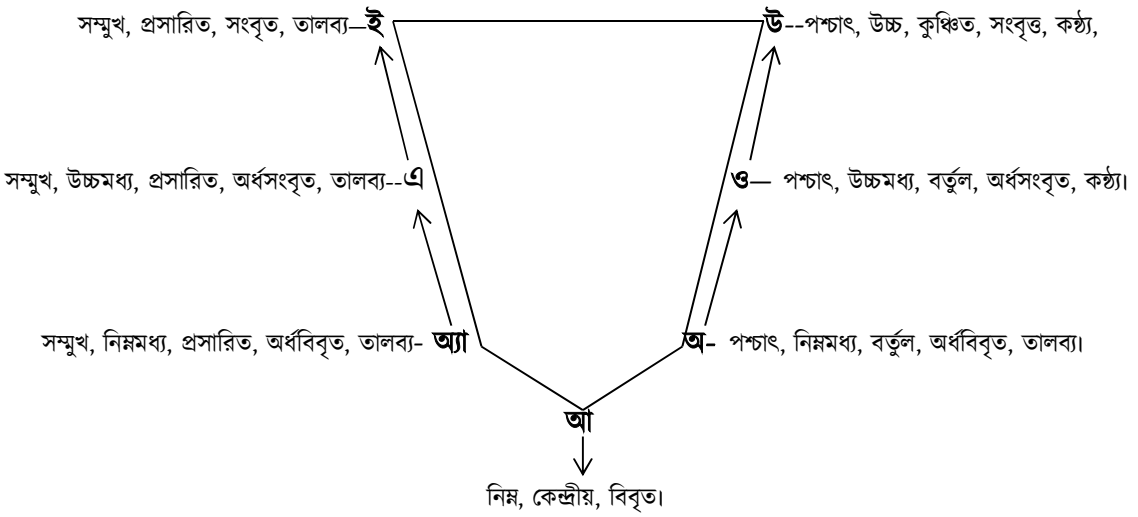

ব্যঞ্জনধ্বনি:- যেসব বাগ্ ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা বা ব্যাঘাত ঘটে সেগুলিকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলা হয়। "স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জন উচ্চারিত হতে পারে না"- কথাটি ভুল। অনেক ব্যঞ্জনধ্বনি আছে যেগুলি স্বরধ্বনি সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে। যেমন- স্ ল্ প্রভৃতি ধ্বনি বিশেষ বিশেষ জায়গায় উচ্চারিত হওয়ার সময় স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয়। 'শ্‌শ্‌শ্' করে কাউকে চুপ করতে বলা হয় তখন স্বরধ্বনির সাহায্য দরকার হয় না। বাংলা ভাষায় মোট ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা হল ২৯ টি কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৯ টি।

ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণে তিনটি মাত্রা লক্ষ্য করতে হয়। যথা--

১. ধ্বনিবাহী বায়ুস্রোতে মুখের কোন্ অঙ্গ বাধা ঘটাচ্ছে, অর্থাৎ উচ্চারণ কে?

২. মুখের কোন্ অংশে (উচ্চারণ- স্থান) এই বাধা ঘটাছে।

৩. এই বাধার ধরন (উচ্চারণের প্রকার) কীরকম। এই তিনটে উচ্চারণের মাত্রা অনুযায়ীই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে।

- ❖ উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী শেণিবিভাগ:- ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ গুলি হল কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য, কণ্ঠনালীয় দন্তমূলীয় প্রভৃতি।

কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন:- যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহবার পশ্চাদ্‌ভাগ উন্নত হয়ে আলজিভের মূলের কাছাকাছি নরম তালুর স্পর্শ করে, সেগুলি কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি। কণ্ঠ বলতে এখানে গলা বোঝায় না। চলিত বাংলায় কণ্ঠ্যব্যঞ্জনধ্বনি পাঁচটি- ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ অর্থাৎ বর্ণমালায় ক-বর্গর ধ্বনি।

তালব্য ব্যঞ্জন:- যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার প্রসারিত সম্মুখভাগ শক্ত তালু স্পর্শ করে সেগুলি তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনি। বাংলা ভাষায় চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্ তালব্যব্যঞ্জন। ঞ্-র উচ্চারণ সংস্কৃতে ছিল, বাংলায় এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই।

মূর্ধন্য ব্যঞ্জন:- যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ পরিবর্তিত হয়ে (অর্থাৎ উল্টে গিয়ে) তালুর ঊর্ধ্বতম অংশে আঘাত করে, তাকে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলা হয়। চলিত বাংলায় ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ আর ড়্, ঢ়্, মধ্যন্যব্যঞ্জন। কিন্তু মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ বাংলায় মূর্ধন্য নয়, তা দন্ত্য ন-এর মতোই।

দন্ত্য ব্যঞ্জন:- যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার প্রসারিত অগ্রভাগ উপরের দন্ত পঙ্‌ক্তির পশ্চাতে লগ্ন হয়, তাকে দন্ত্যব্যঞ্জন বলা হয়। যেমন- ত্, থ্, দ্, ধ্। (ন্, স্ দন্ত্য নাম পেলেও এ দুটি দন্ত্যব্যঞ্জন নয়)

দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দন্ত পঙ্‌ক্তির মূলদেশ (দাঁতের গোড়ায় ঢিভিমতন জায়গাটিকে) স্পর্শ করে, তাকে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন বলা হয়। বাংলায় তথাকথিত দন্তন্য আর 'দন্ত্য'-ন আর 'দন্ত্য' স আসলে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন।

ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠ আর অধর রুদ্ধ বা সংকুচিত হয়ে ধ্বনিবাহী বায়ুর নির্গমে বাধা ঘটায় তাকে ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন বলে। চলিত বাংলায় প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্-এই পাঁচটি ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন।

কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কণ্ঠনালীর মধ্যেই ধ্বনিবাহী বায়ুতে ব্যাঘাত ঘটে, তার নাম কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন। বাংলায় 'হ্' কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন।

- ❖ উচ্চারণের প্রকার অনুযায়ী ব্যঞ্জন ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনি:- যে ধ্বনির উচ্চারণের মুখের বায়ুনির্গম পথ প্রথমে একটু কঠিনভাবে রুদ্ধ করে পরে একটি প্রবল ধাক্কায় সেই বায়ুকে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হল মহাপ্রাণ ধ্বনি।(ঢ় বাদে)।

আর যে-ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরে বাধা ও ধ্বনিনির্গমের মধ্যে বিশেষ প্রবনতা থাকে না, সেগুলিকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি:- যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী তে জোরালো কম্পন হয় তাদের বলে ঘোষ ধ্বনি যেমন সমস্ত স্বরধ্বনি ও বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের ধ্বনি।

আর যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীতে জোরালো কম্পন হয় না, তাদের বলে অঘোষ ধ্বনি। যেমন বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের ধ্বনি।

স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনি:- যে ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরে ধ্বনিবাহী বায়ুর নির্গমপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায় তাকে স্পৃষ্টধ্বনি বলে। স্পর্শ করা নয়, আসল কথা হল মুখের রাস্তার বাতাস বেরোবার কোনো ফাঁক না রেখে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া। সেই বিচারে ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত স্পর্শ বর্ণ কথাটি ঠিক নয়। এর মধ্যে থেকে চ্, ছ্, জ্, ঝ্ কে বাদ দিতে হবে। তাহলে 'ক' থেকে 'ম' ২৫টি থেকে চারটি বাদ দিলে ২১ টি ব্যঞ্জনধ্বনি স্পর্শ বা পৃষ্ট ধ্বনি।

ঘৃষ্ট ধ্বনি বা ঘর্ষিত ধ্বনি:- যে ধ্বনির উচ্চারণে মুখের পথ প্রথমে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে তারপরে সামান্য উন্মুক্ত হলে ঘর্ষণের মতো ধ্বনি উৎপাদন করে বায়ু নির্গত হয় সেগুলিকে ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বাংলায় চ্, ছ্, জ্, ঝ্ এই চারটি হল ঘৃষ্ট ধ্বনি বা ঘর্ষিত ধ্বনি।

নাসিক্য ধ্বনি:- যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে ধ্বনিবাহী বাতাস মুখবিবরের রুদ্ধপথে নির্গত না হয়ে নাসারন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে নির্গত হয়, তার নাম নাসিক্য ব্যঞ্জন। বাংলায় ঙ্, ন্, ও ম্ শুধু এই তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জন।

উষ্ম ব্যঞ্জন:- যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে মুখবিবরের বায়ু নির্গমপথ মুক্ত কিন্তু অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ থাকে, ফলে বাতাস সেই সংক্ষিপ্ত রন্ধ্রপথে স্ফোট বা শিস্ জাতীয় ধ্বনি করে নির্গত হয়, তাকে উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। উষ্ম ধ্বনির সঙ্গে গরম বাতাসের কোন সম্পর্ক নেই। বাংলা ভাষায় শ্, স্, ও হ্ হল উষ্ম ধ্বনি। আবার এর মধ্যে শ্, স্ আবার শিস্ ধ্বনি, কারণ এ দুটির উচ্চারণে শিসের মতো আওয়াজ হয়। ষ্, এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ বাংলায় নেই।

কম্পিত ব্যঞ্জন:- যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে জীহ্বাগ্র কম্পিত হয়ে উচ্চারণ স্থান স্পর্শ করে তা কম্পিত ধ্বনি। চলিত বাংলায় 'র' কম্পিত ধ্বনি।

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন:- যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সম্মুখভাগ দন্তমূল স্পর্শ করে থাকে, তাই ধ্বনিবাহী বাতাস তার দুই পার্শ্ব দিয়ে বহির্গত হয়, তার নাম পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি। চলিত বাংলায় 'ল' একমাত্র পার্শ্বিক ব্যঞ্জন।

তরল ধ্বনি:- শব্দমধ্যস্থ 'ই' 'উ' উচ্চারণের সময় জিহ্বার সম্মুখভাগ উপরে উঠে ধ্বনিবাহী শ্বাসবায়ু নির্গমনের পথে আংশিক অবরোধ সৃষ্টি করায় ধ্বনি ঈষৎ উষ্ম হয়ে যে ব্যঞ্জন সৃষ্টি করে, তাকে তরলস্বর বলে। যেমন- 'র' 'ল'।

নিচের ছকে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল-

উচ্চারণ স্থান ⟶ উচ্চারণ প্রকার ↓	ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	মূর্ধণ্য	তালব্য	কণ্ঠ্য	কণ্ঠনালীয়
অঘোষ অল্পপ্রাণ	প্	ত্		ট্	চ্	ক্	
অঘোষ মহাপ্রাণ	ফ্	থ্		ঠ্	ছ্	খ্	
ঘোষ অল্পপ্রাণ	ব্	দ্		ড্	জ্	গ্	
ঘোষ মহাপ্রাণ	ভ,	ধ্		ঢ্	ঝ্	ঘ্	
উষ্মধ্বনি			স্		শ্		হ্
নাসিক্যধ্বনি	ম্		ন্			ঙ্	
কম্পিতধ্বনি			র্				
তাড়িত অল্পপ্রাণ				ড়্			
তাড়িত মহাপ্রাণ				ঢ়্			
পার্শ্বিক ধ্বনি			ল্				
তরল ধ্বনি			ল্, র্				